সাক্ষ্য

মিমি বিনতে ওয়ালিদ

মননে মুক্তির সৌরভ

সাক্ষ্য

মিমি বিনতে ওয়ালিদ

মননে মুক্তির সৌরভ

প্রথম প্রকাশ	রজব, ১৪৪৫ হিজরী মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশনায়	শিউলিমালা প্রকাশন
যোগাযোগ	Email : shiulimalaacademy@gmail.com Facebook : ShiulimalaAcademy Instragram : shiulimalaacademy Twitter : Shiulimala
মুদ্রিত মূল্য	২১৫৳
ISBN	978-984-98502-1-2

১.

পুকুরের ঘোলা পানিতে মৃদু ঝিলিক বুলিয়ে সূর্য ক্রমেই পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। জন তিনেক বালকের আত্মহারা খচাখচি থেকে রেহাই পেয়ে মেটে রঙ্গা পানি যতই স্বচ্ছ হচ্ছে, ঝিলিক ততই তীব্র হয়ে উঠছে। পুকুরের গা ঘেঁষে মেটেরাস্তা। রাস্তাটা নেমে এসেছে উত্তরের বড় রাস্তা থেকে। রাস্তা পেরিয়ে আরেক পুকুর–সমস্তটাই জাগ দেওয়া পাটের অধিকারে। রাস্তার দুপাশে দুই সারিতে বসে মহিলারা পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে। নিপুণ হাতে সোনালি আঁশ ছাড়াতে আর ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ কথারূপে গাঁথতে তারা অতিশয় মগ্ন। কেউ কেউ আবার শুধু হাত চালিয়ে যাচ্ছে বিদায়ী সূর্যের হুকুমে। পথচারীদের যাতায়াত তাদের খেয়ালের পুরোপুরি বাইরে, যদিও পথের বিতিকিচ্ছিরি গন্ধ আর ময়লা-কাদা থেকে রেহাই পেতে পথিকেরা বিচিত্র ভঙ্গিতে পথ অতিক্রম করছে। হঠাৎ এক পথচারীর দিকে কয়েকজন নারীর নজর আটকায়। যারা খেয়াল করেছে, তারা কানাকানি করে। যারা খেয়াল করেনি, তাদেরও এক নজর দেখার আয়োজন করে দেয়। প্রায় সকলে অদ্ভুত বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেদিকে।

–কিডা? কার বাড়ির মিয়ে না বউ?

সখিনা বিবি সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে। ঠিক উত্তর কারো জানা নেই, যে যার যার মতো জবাব দেয়।

–মিয়ে, বউ কিছু লা। মনে হয় ইস্কুলের লতুন ম্যাডাম।

নও যুবতী মুর্শীদা আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দেয়।

নবাগতা বড় রাস্তা থেকে টেম্পু থামিয়ে নামে। নেমে ঐ মেটেপথটাতেই হাঁটা ধরে। তফাত এই: বিগত পথিকদের মতো পথের গন্ধ, ময়লা-কাদা থেকে নাক, পা বাঁচানোর কোনো জবরদস্তি তার মধ্যে নেই, অথচ গড়নে, বেশভূষায় সাহেবা সাহেবা ভাব স্পষ্ট। তবু হেঁটে চলেছেন যেন আঁশ-ছাড়ানো নারীদেরই একজন–এটিই চোখ আটকানোর বিশেষ কারণ। পরনে সোনালি পাড়ের হালকা

গোলাপী জামদানী শাড়ি, সোনালি রঙ্গা ফুলহাতা ব্লাউজ আর মাথায় একই রঙের একটা ওড়না কোনোমতো পেঁচানো। হাতে মস্ত এক ব্যাগ–সাধারণত নারীরা এতবড় ব্যাগ নিজে বহন করে না। কিন্তু নবাগতা নির্বিঘ্নে বহন করছে; হয়তো ব্যাগটি আকারে ঢাউস হলেও ভেতরটা ফাঁকাই হবে। হাঁটতে হাঁটতে একবার ডানহাতে পরা চিকন ফিতার বাদামী ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। তবু চোখ জোড়া তাঁর পথের নারীদের কৌতূহলী চেহারার দিকে উৎসুক। হয়তো বলছে, কিছু জানার আছে? জিজ্ঞাসা করো, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে তোমাদের সমস্ত বিস্ময় ঘুচিয়ে দিই, জানাই–আমি অপরিচিতা নই। কিন্তু এ মুখচোরা রমনীরা কেবল পরস্পরে কানাকানিতেই পটু, নবাগতার হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আত্মীয়তার আভাস পেয়েও একটাবার একটা ডাক পর্যন্ত দিলো না। ভদ্র মহিলা চটি পায়ে পানি-কাদা ছড়ানো পথে থস্ থস্ তাল তুলে হেঁটে চলে।

নাজিরপুরের শেষ মাথায় এসে চরনাজিরপুরের দিকে পথ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা পাকা রাস্তা, জনসমাগমে পূর্ণ আরেকটা মেঠোপথ; দুপাশে যতদূর চোখ যায় ফসলের খেত এবং সরল বলে সংক্ষেপও বেশ। তবে কৃষক, ব্যাপারি, বখাটে জুয়া খেলোয়াড় ছাড়া এ পথে আর কেউ থাকে না। বিপদে পড়লে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই। তবু ভদ্রমহিলা সন্ধ্যা মাথায় করে একেবারে নির্দ্বিধায় এ পথই ধরে।

ঘাসের ফাঁকে তৈরি হওয়া সরু শুভ্র পথে পা ফেলে ফেলে হেঁটে চলে। কত ফসল! মাটির হাসি হয়ে ফুটে আছে দিগন্ত ছেয়ে। সত্যিই পৃথিবীটা গোল, না হলে ছোট ছোট এসব গুল্ম, উদ্ভিদের উপর কীভাবে আকাশ ঢলে পড়ে! চাষারা এখনও খেতের এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। বড় বাবলা গাছটার নিচে রঙবেরঙের ময়লা কাপড়ে বাঁধা গোটা আষ্টেক পুঁটলি–দুপুরের খাবার খেয়ে জড়ো করে রেখেছে। দূরে স্যালো-মেশিনের ছোট ছোট কয়েকটি ঘর, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেসব ঘরে হলদে বাল্ব জ্বলবে হয়তো।

নাকে আবার সেই গন্ধ ভেসে আসে–হ্যাঁ কয়েক কদম বাদেই তো হাতের ডানে একটা ডোবা, সেখানেও পাট জাগ দেওয়া হয়েছে। ডোবার পেছনে চার-পাঁচটা বড় বড় গাছ: মেহগনি, কড়ই আর বাবলা–ছায়া ফেলে আশপাশটায় সন্ধ্যা নামিয়েছে আগেভাগেই। কিন্তু উত্তর দিকে সূর্যের নরম আলো এখনও বেশ ছিটিয়ে আছে ধানের কাঁচা শিষের মাথায়। পথিক হাঁটার গতি বাড়িয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায়–সম্মুখে ভাঙা ব্রিজের আগায় ডানপাশে তিনটা মাথা জড়ো হয়ে আছে। জুয়া খেলছে বা অন্য কোনো কিছু করছে।

পাশব্যাগ থেকে তিনটি পাথরের অঙ্গুরী বের করে ডানহাতের তিন আঙ্গুলে পরে পথিক পুনরায় দ্রুত তালে হাঁটা আরম্ভ করে।

পূর্বদিকে মুখ করে বসা যুবক মাথা তুলতেই পথিককে দেখে তাজ্জব হয়। কতকাল এ দিকে কোনো মেয়েলোক আসে না। ছোট ছোট মেয়েরা ভাত-তরকারি নিয়ে আসতো টুকটাক, সকিনা বানুকে বেইজ্জতি করার পর তাদেরও আর দেখা যায় না। মেয়েমানুষ মাত্রই আর এ মুখো হয় না। কিন্তু এ কে! মেয়েলোক?–নাকি পরী? মেয়েলোক, আবার এতসুন্দর! এ পথে কেন আসবে?

নাজিমের মগজের মধ্যে আদিম নেশা বঙবঙ করে ঘুরতে থাকে, দুজনের পিঠ চাপড়ে সামনের দিকে তাকাতে বলে। ওদের একজনের বয়স নাজিমের মতোই ত্রিশ ছুঁইছুঁই আর একজন চৌদ্দ-পনেরো বছরের। বাকিরাও নাজিমের মতো বিভৎস উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়।

–গুলাপি ম্যাডাম! ও গুলাপি ম্যাডাম, টেনের তিন লাবিছেন? আহ! বড় একাএকা লাগে আমার। এহ মজিত! গান ধর হে! ম্যাডাম একটু লাচুক।

নাজিমের হুকুমে মজিদ গান ধরেঃ চুমকি চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে। বাশার প্রতিবাদ করে বলে, "ধুর শালা! ম্যাডাম তো সঙ্গী হয়েই গেছে। ভালো গান ধর।"

বলতে বলতেই বাশার ব্রিজ থেকে ছিটকে খেতের মধ্যে পড়ে। কী হয়ে গেলো! ও বুঝতেই পারে না, কেবল আকস্মিক তীব্র আঘাতে গুঙরে উঠে দুপায়ের মাঝে দুহাত চেপে ধরে। দুচোখে ঘনকুয়াশার জাল, চারদিকে ঢেউ খেলানো ধানখেত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদবুদের উপর বিশাল আকাশকে অস্পষ্ট দেখা যায়। নাজিমের রক্ত চুয়ানো নাক-মুখের ছবিও একবার ঝাপসা হয়ে ভেসে ওঠে, কিন্তু ভয়টা ছিলো একদম চকচকে। একই সাথে দুহাত মুঠো করে নাজিমের দুগাল ঘুষিয়ে রক্তাক্তও করেছে। নাজিমের কপালে দুঘা বেশি লেখা ছিলো বলে, শালী বলে চিৎকার করে পথিককেও আঘাত করতে যায়। কিন্তু খেয়াল করে, তার মস্তিষ্ক এ হুকুম দেওয়ার আগেই পথিক কীভাবে জেনে গেছে! হাত ঘুড়িয়ে পেছনে টেনে বাশারের মতো তাকেও দু পায়ের মাঝে কষে এক লাথি মারে। মুহূর্তেই সমস্ত তেজ লুটে পড়ে খেতের কিনারে। মজিদও কয়েকবার ধেয়ে ধেয়ে এসেছিলো, কিন্তু আঘাত করতে পারেনি।

–বাড়ি কোথায়? কার ছেলে?

গম্ভীর গলায় পথিক প্রশ্ন করে

–নিয়ামতপুর। আমি বারেক পরামানিকের ছাওয়াল।

–নিয়ামতপুর! আমার সাথে চলো।

–আপনে কিডা? আপনেক তো দেকিনি কোনোদিন!'

–কে আমি!

পথিক পেছন ফিরে মজিদের দিকে তাকায়। সে চোখে রহস্যের কূল-কিনারা পায় না মজিদ। ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়।

–আমার আব্বাক কিছু কবেন না। আইজকেই পথোম আইছি। নাসির ভাই উরে সাথে খেলে, আইজ নাসির ভাইয়েক পায় নি তাই আমাক জোর কইরি ধইরি লিয়াইছে। আমার আব্বা জানলি মাইরি ফেলবি আমাক।

পথিক দ্রুত তালে হাঁটতে হাঁটতে মুচকি হাসে। মজিদের গা এবার ছমছম করে ওঠে। পথিকের পরিচয় রহস্যের মোড়কে আবৃত থেকে তাকে ভয় দেখায়–মানুষ না পরী? এ দুই পরিচয় তাকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। মজিদের পা আর চলতে চায় না, থেমে যায় তারপর পেছনের দিকে দৌড়াতে থাকে।

–নাজিম ভাই, বাশার ভাই! পলান, ওটেন! পরী!

গলার মধ্যেই শব্দগুলো ফোঁস ফোঁস করে মজিদের। নাজিম, বাশার তখনো নেতানো।

পথিক গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। মন থেকে তার বিগত ঘটনার চাঞ্চল্য কাটে না। কিছুক্ষণ আগে সেই কি ছিলো! মুহূর্তের মধ্যে সেই কি বাজে লোকগুলোর হাত থেকে রক্ষা পেলো! আকাশের দিকে একবার তাকায়–চোখ জ্বলে ওঠে তাঁর, লাবণ্য ঠিকরে পড়ে চেহারায়। তিন তিনজন যুবক এক নারীর কাছে অসহায়! দুর্বল নারীদের ওপর ব্যাটামি খাটাতে খাটাতে নিজেরাই কতটা দুর্বল হয়ে গেছে, তার কোনো আন্দাজ ওদের নেই। তাই খুব সহজেই একজন নারীর সামান্য আঘাতে মুহূর্তেই ঢলে পড়ে। কিন্তু সামান্য আঘাত কি? নামকরা বড় ওস্তাদের যোগ্যতম শিষ্য সে–সাহসে, কসরতে তার ধারেকাছে কে ছিলো?

সূর্য পশ্চিম আকাশে আত্মগোপন করে। পথিক বড় রাস্তা ধরে গন্তব্যে হাজির হয়।

২.

বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজির মধ্যখানে অতিপুরাতন বড়সড় বাড়ি। গ্রামের লোকজন এখনও জমিদার বাড়ি বলে বাড়িটাকে। কেউ কেউ আবার রাজবাড়িও বলে।

মিরাজ উদ্দিন পরিবার-পরিজন নিয়ে দুই যুগেরও বেশি সময় বাস করছে। জমিদার মির্জা সবুর খানের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় বলে গ্রামে তার খুব কদর। চেয়ারম্যান, মেম্বারের সাথে গলায় গলায় মহব্বত–দিন যায় বদল আসে, কিন্তু সম্পর্কের কোনো হেরফের হয় না। কারণ সে জমিদার পরিবারের আত্মীয়। মির্জা সবুর খানের পর জমিদারির চল হারিয়ে গেলেও জমিজমা, সহায়-সম্পত্তি, ইজ্জতে কোনো ভাটা পড়েনি–সেই সমস্ত ফজিলত মিরাজ উদ্দিনই সপরিবারে ভোগ করছে। আজ তার বাড়িতে চেয়ারম্যান, মেম্বার সাহেবের আগমন ঘটেছে। উদ্দেশ্য: ইসলামপুরের এক জমি নিয়ে দুই কৃষকের বিবাদ মেটাতে কী ফয়সালা করা যায় তার শলা-পরামর্শ। সাত-আট কিসিমের ফল এবং পিঠার পসরাকে ঘিরে বৈঠক চলছে।

–বেগমসাহেবার হাতের পিটির স্বাদ আর কুথাও নাই। নাকি বলো মেম্বার?

–আম্মাজানের হাতের কিরামতি। আল্লাহ্ পাকের রহমত।

–জমিডার কী করি কন তো, জমিদার সাহেব?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফয়সালাকারীরা আসল কথায় ঢোকে। মিরাজ উদ্দিন নড়ে বসে গম্ভীর গলায় বলে, “ঘটনাডা কী কওতো!”

চেয়ারম্যান এক ঢোক পানি পান করে ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে।

–বুচ্ছেন, ফজলেরে জমি। উরা সাত ভাই। ইর মদ্দি একটা–ছোটডার বড়ডা আরকি, জমি বেইচি দেছে মকবুলের বড় ছাওয়ালের কাছে। সব হয়ে গেছে এখুন ছয় ওয়ারিশ আইসি দাবি করতেছে যে, উরা ব্যাচেনি। এদিক ইরা ট্যাকা পয়সা সব দিয়ে দেছে, কিন্তু দখল লিতি পারতেছে না। লিতি গেলি মারামারি লাইগি যাচ্ছে। তিন দফা মারামারি হইয়েও গেছে।

–তে ফজলের সে ভাই ট্যাকা ফেরত দিক। যে ভাই ব্যাচেছে তাক আগে ধরুক। আর ভাগভাগির জমি মকবুলের ছাওয়াল একজনের তিন কেনেই বা কোন আক্কেলে। ফল্ট সবদিকেরই বুচছাও?

–ফজলের ভাই তো পলাইছে। বউ ছাওয়ালপল লিয়ে বাড়ি ভাঙি চইলি গেছে।

মেম্বার জবাব দেয়।

দরজায় জোরে জোরে টোকা মেরে ফরিদ ঘরে ঢোকে। তিন দিকে ফিরে তিনটা সালাম দিয়ে কাচুমাচু করে বলে, “ভুল কইরি ঢুইকি পরিছি।”

–ভুল কইরিই এত জোরে টুকা মারলু! যা তো এবার ঠিক কইরি মার তো! নিশ্চিত দরজা ভাইঙি ফেলবুনি। বুইজলেন চেয়ারম্যান! ইক আদব শিকাতি

পারলাম না। জমিদার মির্জা সবুর খান, আমার মুরুব্বি। এত মজবুত কইরি এ বাড়ি বানাইছে যে ইনশাল্লাহ সহজে ইর কিছু হবি লা, কিন্তু এই ছুকরা কপাটগুইলি ভাঙ্গবিনি।

ফরিদ জিহ্বায় কামড় কেটে বলে, "আহ! লজ্জা দিচ্চেন জমিদার সাহেব! আসলে হইছে কি, একজন মহিলা আইছে। কোনোদিন দেকিনি তাই বাইরে দাড়া কইরি থুইছি। উনুমতি ছাড়াই ঢুইকি পততি লাগিছিলি। তে কইছি মালিকের উনুমতি ছাড়া ঢুকা যাবিলা। মহিলা আপনের উপর রাইগি গেছে, কচ্ছে কই তুমার মালিক, কিডা মালিক দেকি! এমন একটা ভাবসাব, মনে হচ্ছে সেই মালিক। আমার সাতে আর কতা কবি লা, আপনেক এক্ষুণি যাতি কচ্চে।"

–মহিলা! এই সাঝের বেলা! কিডা! আসতি দে তো। ক ক আসতি ক একেনে।

মিরাজ উদ্দিনের চোখে কৌতূহল দানা বাঁধে। ফরিদ কপাটে ধরাম শব্দ করে বেরিয়ে যায়। আবার ফিরে এসে লজ্জিত মুখে বলে, "বিয়াদপি মাপ করবেন। বাতাস খুব হচ্ছেতো।"

–যাহ বেকুব!

মিরাজ উদ্দিন চোখ রাঙায়।

ভদ্রমহিলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই তার বড় ব্যাগটা ধপাস করে রাখে। তিনজনের দিকে চোখ বুলিয়ে ফরিদের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, "কে! কোনজন মালিক? এখানে কে জমিদার সাহেব? কে!"

ফরিদের আঙ্গুলি নির্দেশের সাথে সাথে মিরাজ উদ্দিন এগিয়ে এসে বলে, "আমি, আমি। তুমি কিডা? কী দরকার। ""

–দরকার আপনার পরিচয় জানা।

–বিচার-শালিস করার থাকে তো কও আমরা কইরি দি। কার বউ তুমি? একদম ব্যাগ-ট্যাগ লিয়ে আইছাও দেকতিছি। মাতা একদম লষ্ট হয়ে গেছে? জমিদারের পরিচয় জানতি চাও। মিয়ে ছাওয়ালের বুদ্ধি দেকো!

চেয়ারম্যান তাচ্ছিল্যের সুরে বলে যায়।

–কিডা তুমি?

খানিকটা রাগের সাথে মেম্বারও প্রশ্ন করে।

–আমারে কাম আছে। কী বাবদে আইছাও? কিডা তুমি?

–মির্জা হুমায়রা সাদিক।

–মির্জা হুমায়রা সাদিক!

চকিতেই মিরাজ উদ্দিনের চেহারা পাংশু হয়ে ওঠে। ধমনীর মৃদু ঢিপঢিপ যেন কোন মেঘের ইশারায় গর্জে ওঠে– ভয়ানক তুফান বয়ে যায় বুকের অন্দরে। পাঁজরের ভেতরের এ তুফান কেবল ভেতরেই থাকবে না; মিরাজ জানে, এই একটি নামের হাতে তার সমূদয় ইজ্জত বাঁধা; দাপট, প্রতিপত্তি– ক্ষমতার নামনিশানা বাঁধা। মির্জা সবুরের রক্তের কোনো আত্মীয় না, কাল কাল ধরে ভৃত্য ছাড়া তার বাপ-দাদা আর কিছুই না, অতএব সে-ও না; এই চাপা পড়া সত্য এতবছর পর বেরিয়ে তার ইজ্জত নিয়ে কী ভয়ানক মশকরা করবে তার কোনো আন্দাজ পায় না মিরাজ। যারা শ্রদ্ধায় পদলেহন করছে আজ তারাই হাসবে খিলখিল করে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে লোকের তামাশা ঠেকাবে কী করে; তাদের নাম, নামের প্রথমভাগের মির্জা আজ হাসির খোরাক হবে? শরীর নিথর হতে চায়; ঠোঁট চেষ্টা মানে না, থরথর করে কাঁপে, কথা বের হতে চায় না। এই ধৃষ্টতার অপরাধে যদি রাজপাট থেকে একেবারে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেয়!

–হ্যাঁ! মির্জা হুমায়রা সাদিক। জমিদার মির্জা আতাউর রহমান খানের পুত্র মির্জা গালিব খান। তাঁর পুত্র দাদা, মির্জা সবুর খান। দাদার আওলাদদের মধ্যে কলেরায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র পুত্র, মরহুম আব্বাজান মির্জা সাদিক খানের একমাত্র সন্তান, মির্জা হুমায়রা সাদিক।

–আম্মাজান! আপনে আসপেন তা তো কিছুই কন নি! কলি সব গোছগাছ কইরি থুতাম। আপনে বলে দেশের বাইরে!

–কতটা এলোমেলো হয়েছে সেটা না দেখলে গোছাবো কী করে, মিরাজ চাচা?

চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আবার বলে, “আপনাদের গ্রামে চলেই এলাম। আপনাদের একজন করে নিতে আশা করছি কোনো আপত্তি নেই?”

–আম্মা! আপনের জন্যি আমার জান কুরবান হোক। আপনি আইছেন ইর চায়ে বড় সুভাগ্য আমারে আর কী হতি পারে!

–ধন্যবাদ। মিরাজ চাচা?

–জি আম্মা!

–আপনাদের আলাপ শেষ হলে উনাদের বিদায় দেন আর আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

–জি আম্মা।

ঝিঁঝি পোকার কান ধরানো ডাকাডাকি শ্রান্ত হয়ে মিশে গেছে নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতায়। চেয়ারম্যান, মেম্বার বিদায় নিলে সারাবাড়িতে পাক-সাফের ধুম পড়ে যায়। রাত বলে গড়িমসি নেই কোনো। ঝাড়-পোছ, মাজা-ঘষা আর আসবাবপত্র টানা-টানির শব্দ উৎসবের আমেজে মাতিয়ে তোলে জমিদারবাড়ির চৌদিক। আনাচে-কানাচে নতুন নতুন রঙচঙে বাতি লাগানো হচ্ছে, খুশবু ছড়ানো হচ্ছে দিকেদিকে। কিছু আসবাবপত্রেরও স্থান বদল চলছে। শোয়ারঘরে ঝুলকালি ঝেড়ে নতুন ঘাসরঙা পর্দা ঝুলানো হয়েছে দক্ষিণের জানালায়; খাটের সাজের খাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাফ করছে, আদরী। খাটের পাশে ছোট পাশ টেবিলে মাজা কাচের জগে পানি টলমল করছে। পশ্চিম দেয়ালে লম্বাটে বইয়ের তাকে শ'খানেক বই তোলা হয়েছে। আরো কতগুলো নিচে জড়ো হয়ে আছে।

হুমায়রা ঘুরেঘুরে তদারকি করে। মানুষগুলো নতুন, এক-দুজন ছাড়া কারো মুখ দেখা হয়নি আগে তবু প্রথম বলে মনে হয় না একবারো। সবার ভিড়ে ফরিদের দৌড়াদৌড়ি চোখে পড়ার মতো–হুমায়রাকে সালাম করে, ক্ষমা চেয়ে কাজে নেমে পড়েছে, কোনো এদিক ওদিক নেই। খোদ মিরাজ উদ্দিন এসে বিছানার চাদর বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তার মুখ এখনো কালো, শুকনো। কাজের ছোকরাদের কারণে-অকারণ বকাবকি করছে, কাজের রঙবেরঙের খুঁত বের করছে। আদরীকে রাজ্যের বাসনপত্র নিয়ে মাজতে বসিয়েছে, আবার মোছামুছির কাজেও দফায় দফায় ডেকে নিচ্ছে। হুমায়রা একে অন্তত দুইবার দেখেছে, কিন্তু চেহারা একদম মনে নেই কেবল নামটা খুব মনে আছে, আদরী! দুই বার হলেও এক ঝলক করে দেখা, মনে থাকে কী করে!

কাসেম দুখানা সোফা টেনে দরজার কাছে ভিড়িয়ে রাখে।

–আরে! ওকেনে থুলু ক্যা? ভিতরে লিয়ে আয়। মিরাজ তেতে ওঠে। কাসেম বোঝে না, মিরাজ মির্জা এত তেতে আছে কেন।

–আনতিছি।

–না না! সোফা ভেতরে এনো না, শোবার ঘরে সোফা দিতে হবে না। মিরাজ চাচা, বৈঠকখানাও গোছাতে হবে। তবে আজ থাক, সবাইকে এখন কাজ শেষ করতে বলে দেন।

–জি, আম্মাজান। কয়ে দিচ্ছি। আপনে তাহালি একুন খায়ে ল্যান। নাকি?

–হ্যাঁ। খাবার দিতে বলেন।